Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা : পরাবাস্তবতা ও প্রকরণ

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.2
Pages	23-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা : পরাবাস্তবতা ও প্রকরণ

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী*

ক.

বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতায় আবদুল মান্নান সৈয়দের (জ. ১৯৪৩) অবস্থান চিহ্নিত হতে পারে একজন কলাকৈবল্যবাদী কবি হিসেবে। জীবনের দুর্বিষহ সংগ্রাম ও আলোড়নকে স্বীকার করে নিয়েই যিনি নিমজ্জিত থাকতে চান স্বেচ্ছা-আত্ম-বিস্মৃত এক জগতে। আর বাংলাদেশের কবিতায় পরাবাস্তব কবিতা-চর্চার একক ও নিঃসঙ্গ শিল্পরূপকারও তিনি। Art for Art's sake-এর প্রবক্তা হিসেবে মান্নান সৈয়দ ষাটের সময়পর্বে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁর শিল্প-অন্বেষী চেতনায়। আর এর উৎস সম্পর্কে বলা যেতে পারে : 'সমাজের অসংখ্য অনুশাসন থেকে তার প্রয়োজন তার নিত্যনৈমিত্তিক অভাববোধকে পূর্ণ করার দায়িত্ব থেকে শিল্প যখন মুক্তি চায় তখনই কলাকৈবল্যবাদের উদ্ভব।'[১] তাঁর এ আত্ম-উদারবর্তদ্রষ্টাসুলভ জীবনভঙ্গি তাঁকে শুদ্ধ শিল্প-অন্বেষার নামে পলায়নবাদীও করে তুলেছে খানিকটা। আর এ-সূত্রেই তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায় পরাবাস্তব শিল্প চর্চার সচেতন প্রয়াস। তিনি এ ধারায় শিল্প-সফল হলেও কখনো কখনো পুনরাবৃত্তি, অতিকথন, একমুখী বিষয় চেতনার দোষে দুষ্ট। সমাজ, রাষ্ট্র, স্বকাল এবং সুগভীর জীবনদর্শনকে বিস্মৃত হয়ে মান্নান সৈয়দ জীবনের যে চিত্র তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন সেখানে মানুষের সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, মুক্তিও নেই। এ কারণেই ষাটের শহীদ কাদরী (জ. ১৯৪২), রফিক আজাদ (জ. ১৯৪৩), আবুল হাসান (জ. ১৯৪৭-১৯৭৫), নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪২) প্রমুখের কবিতায় যে জর্জরিত যুগাত্মাকে অনুধাবন করা যায় মান্নান সৈয়দ সেখানে এক স্বপ্নময় ফ্যান্টাসির জগতে ভ্রামণিক। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭); জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯); ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪); পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮২); কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড(১৯৮২); মাছ সিরিজ (১৯৮৪) প্রভৃতি কাব্যে তাঁর প্রমাণ আছে।

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থেই মান্নান সৈয়দের শিল্প ও কাব্যভাবনা প্রকাশিত; যা তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলোতেও অক্ষুণ্ন থাকে। মূলত মান্নান সৈয়দ এই একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থেরই প্রসারণ ঘটিয়েছেন পরবর্তী কাব্যগুলোতে। এ-গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে সৈয়দের পরাবাস্তব শিল্পবোধ। একদিকে

সহযোগী অধ্যাপক, ;, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অবরুদ্ধ সময় এবং নিরস্তিত্ব সময়চেতনা অন্যদিকে প্রতিবাদহীন ব্যর্থতাজনিত আত্মপলায়নমুখী মানসিকতা এ দুই চেতনায় নিমজ্জিত মান্নানের কাব্যভাবনা। প্রচলিত সমাজ-জীবনে সুস্পষ্ট ইতিচেতনার অভাবজনিত কারণেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন স্বপ্নময় পরাচৈতন্যের ব্যাকরণে। মান্নান সৈয়দ প্রতিবাদ করতে শেখেন নি, আবার প্রতিবাদহীন নিরুদ্ধ সময়ে নিজেকে প্রবাহিত করতেও তাঁর দ্বিধা।

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে মান্নান সৈয়দের পরাবাস্তব শিল্পকলাকীর্তির অনুষঙ্গবহুল কাব্যরীতির প্রয়াস প্রথমেই লক্ষযোগ্য। তাঁর কাব্যজগৎ উপমা, রূপক, চিত্রকল্প ও প্রতীকের এমন এক ঘনীভূত আকর যেখান থেকে মনে হতে পারে মান্নান সৈয়দ কেবলি একজন নির্লিপ্ত দ্রষ্টা; যাঁকে অনিবার্যভাবে অবিরল বৈপরীত্যময় ঘটনাস্রোত স্পর্শ করে যায় এবং যিনি শেষঅব্দি এক নিরুপায় দর্শক, কখনোবা তিনি নিজেই তার শিকার। 'অশোককানন' কবিতায় মান্নান সৈয়দ এক অলৌকিক পরাবাস্তব জগতে ঘুরে ঘুরে দিগ্‌ভ্রান্ত, অসহায়—

> জ্যোৎস্না ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে দরোজায়, সব দরোজায়, আমার চারদিকে যতোগুলি দরোজা আছে সময়ের নীলিমার পাতালের; জ্বলছে গাছসকল সবুজ মশাল; বাস একটি নক্ষত্র, পুলিশ একটি নক্ষত্র, দোকান একটি নক্ষত্র : আর সমস্তের উপর বরফ পড়ছে।—এরকম দৃশ্যে আহত হয়ে আমি শুয়ে আছি পথের উপর, আমার পাপের দুচোখ চাঁদ ও সূর্যের মতো অন্ধ হয়ে গেল, আর যে-আঁমার জন্ম হল তোমাদের করতলে মনোজ সে অশোক সে : জ্যোৎস্না তার কাছে ভূত কিন্তু একটি গানের উপর, দরোজা তার কাছে পুলিশ কিন্তু একটি জন্মের উপর, মৃত্যু তার কাছে দোজখ কিন্তু একটি ফুলের উপর।[২]

আবদুল মান্নান সৈয়দ এভাবেই স্বপ্নের ব্যাকরণে এক অশোককাননের ভ্রামণিক অথচ পথহারা পথিক। তাঁর চেতনায় ঘুরে ঘুরে আসে রাত্রি, দোকান, পুলিশ, বাড়ি ও ভৌতিক আবহধর্মী রাত্রি-অনুষঙ্গ। আসলে তিনি এক নিরুদ্ধ সময়ের মধ্যে বন্দী বলেই সম্ভবত নিজেকে আবিষ্কার করেন শিল্প-সম্ভাবনাহীন এক উন্মূলচারী রাস্তায়। তিনি সেই সাজানো উদ্দিষ্ট বাড়িতে অনুপ্রবেশ করতে চান কিন্তু এর চাবিটি তাঁর হতে নেই বলেই তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। তবে–

> আমি ভূতের মতো উল্টা-পায়ে পুরোনো এই বাড়িতে উঠছি, নামছি, চাবিহীন হাসছি—কতোদিন আমি কাঁদিনি, মনে হলো : আমারএকটি মাত্র কান্নার ফোঁার উপর বিরাঁ একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, নোঙর নেমে গেছে মাটি ভেদ করে পাতালের দিকে, মাল্লারা দড়িদড়া ছুঁড়ে দিচ্ছে চারদিক থেকে[৩]

মান্নান সৈয়দের এ কাব্য প্রয়াস সকল ব্যাকরণের ঊর্ধ্বে আরো এক ব্যাকরণ। তিনি সমস্ত প্রচল প্রথা ও সংস্কার জ্ঞান, বোধি অস্বীকার করেন বটে কিন্তু প্রকারান্তরে

আবদ্ধ হয়ে পড়েন ভিন্নতর ব্যাকরণে। তাঁর গতি ও সম্ভাবনা নতুন বিশ্বাসকে জানান দিতে চেয়েও অক্ষম ও নিরুপায়। কোনো দিকনির্দেশনাহীনভাবেই তাঁর এ অভিযাত্রা—

> পণ্ডিতকে বলবো 'দাও হে অভিধান ফেলে তোমরা যাকে দুঃখ বলো তাতেই যদি আমি আনন্দ পাই, কী তাহলে উপায় তোমাদের? ছিঁড়ে ফেলো ব্যাকরণ, বিধান আমরা চাই না বলেই তো কবি, আমি এক নতুন ব্যাকরণ সৃষ্টি করবো যা আসলে ব্যাকরণই নয়।'[৪]

কিন্তু কখনো কখনো সমাজলগ্ন কোনো বাস্তব কারণই হয়তো মান্নান সৈয়দের এরকম উদ্ভটতার কারণ। সৈয়দ এ সমাজ ও সমাজের অবক্ষয়কে দেখে দেখে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু সেই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতেও তিনি অপারঙ্গম, আবার এর অন্তর্চাপটিও তাঁকে সুস্থির হতে দেয় না। ফলে তিনি পরাবাস্তবতার আড়ালে এক ধরনের স্যাটায়ারেও অবগাহন করেন। তাঁর অসহায়ত্ব একজন কামুক স্বামীর মতই প্রতীয়মান হতে থাকে যার সামনেই ঘটে তার স্ত্রীকে নিয়ে রিরংসাবৃত্তি—

> অসীম যে মেয়ে অলিতে-গলিতে ঝিমন্ত ফোয়ারায়, বিচ্ছুরিত আঙুরঅলার গাড়ির পাশে, ইঁদুরের মতো ধাবমান ট্যাক্সিতে, রাস্তায় ও জোচ্চোরের প্রশংসিত আস্তানায় সারারাত্রি সর্বত্র ফেরি করে বেড়িয়েছে শরীর, মাটিতে থুবড়ে পড়ায় মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল তার সতেরো লক্ষ চার হাজার একশো তেইশটি তারা, আর তার ত্বকের ভিতরকার উচ্ছল দোকানগুলি মরে যেতে থাকল একে-একে; আর আমার শক্তি তার কোল থেকে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছে যখন আমি কামুক স্বামীর মতো আছি আরামের তল্লাশে, যে-আরাম কাৎ করে ফেলে দেয় পণ্ডিতকে;[৫]

পরাবাস্তববাদ বা sur-realism মূলত একটি শিল্প-আন্দোলন। এই আন্দোলনের বিকাশ চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে ঘটলেও এর বিস্তৃতি ঘটেছে সাহিত্যসহ নানা সুকুমার কলাবৃত্তিতে। এর উদ্ভবের পিছনেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণ ছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ইউরোপীয় সমাজবাস্তবতার ভয়াবহতা ও বীভৎসতায় বাস্তবতা বিমুখ একদল শিল্পী দেশকাল ঊর্ধে কোনো জগতে পাড়ি জমাতে চাইলেন। এক্ষেত্রে ফ্রয়েড ও ইয়ং-এর স্বপ্নবার্তা তাঁদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করল। চেতন অংশের চেয়ে অবচেতনের গহন সীমাহীন জগতে তাঁরা স্বপ্নের কামনা ও বাসনাকে রূপায়িত করতে চাইলেন। এই অবচেতনের স্বপ্নে নিমজ্জিত থেকেই তাঁরা শিল্প-সাহিত্যে সংযোজন করলেন নতুন মাত্রা যাকে 'অতিবাস্তব' (supper-realism) বলা যেতে পারে। 'অতিবাস্তব' বা 'সুপাররিয়েলিজম' থেকে sur-realism 'সাররিয়ালিজম' বা পরাবাস্তববাদ-এর উৎপত্তি। অবশ্য পরাবাস্তববাদের পূর্বসূত্র নিহিত আছে 'ডাডাবাদের' মধ্যে। ডাডাবাদীরাই প্রথম যুক্তি ও নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করতে থাকেন।

জুরিখে একদল লেখক এবং শিল্পী এর স্রষ্টা। রুমানিয় কবি ত্রিস্তান জারা (Tristan Tzara), জর্মান লেখক হ্যাগো বল (HugoBall), রিচার্ড হালসিনবেক (Richard Hulsenbeck) এবং Alsatian কবি ও স্থপতিবিদ হেনস্ আর্প (Hans Arp) এ নতুন মতবাদের ব্রতী হলেন। ব্রেতোঁ এবং লুই আরগঁ গোড়ার দিকে এঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এঁরা প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং যে কোনো সীমানাকেই অস্বীকার করলেন। তাঁদের শ্লোগান ছিল 'যা কিছু স্থির ও সুস্থিত তাকে ভাঙো, তাকে গুঁড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে মারো প্রাচীনকে।'

কিন্তু ডাডাবাদীরা প্রকারান্তরে শিল্প-সাহিত্যে নৈরাজ্যকেই প্রশ্রয় দিলেন। বোধগম্যতার ধার না ধেরে, অর্থহীনতার কুয়াশায় উদ্ভট কল্পনা ও ধ্বংসাত্মক আকাঙ্ক্ষা, এ দুয়ের সমীকরণই হল এ আন্দোলনের ফল। একসময় তাঁদের এ মতবাদ দুর্বল হয়ে পড়লে এরই প্রভাবজাত সাররিয়ালিজমের উদ্ভব ঘটে। সাররিয়ালিস্টরা মনের অবচেতন অংশকেই গুরুত্ব দিলেন। তাঁদের মতে, মানুষের চেতন অংশের তুলনায় অবচেতন অংশেরই পরিধি বেশি। আর অবচেতনের লীলা-চাপল্যকে রূপায়ণ করাই হলো এর মূল কথা। কারণ মানুষ স্বপ্ন দেখে এর কোনো ক্রম কিংবা পারম্পর্য নেই, স্বপ্ন কোনো যুক্তি ও নিয়মের ধার ধারে না, কিন্তু স্বপ্নের ঘটনাক্রম কোলাজসদৃশ বিচ্ছিন্ন হলেও অবিচ্ছেদ্যভাবে দৃশ্যগ্রাহ্য। স্বপ্নে আছে উল্লম্ফন, তাই স্বপ্নের ব্যাকরণই তাঁদের কাছে গুরুত্ববহ হয়ে উঠল। যুক্তি ও শৃঙ্খলার সকল সীমাসূত্র পরাবাস্তববাদীরাও অস্বীকার করলেন। ভগ্নক্রম চৈতন্যের অবচেতন অংশের রূপায়ণে তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল ও স্বপ্নময় প্রকাশকেই আরাধ্য বলে গণ্য করলেন;

> The expressed aim was a revolt against all restrains on free creativity, included among the restraints to be violated were logical reason, Standard morality, social and artistic conventions and norms and any control over the artistic process by fore thought and intention.[৬]

ফরাসি আঁদ্রে ব্রেতোঁ পরাবাস্তবকে সারাবিশ্বে জনপ্রিয় করেন এবং একটি শিল্প আন্দোলন হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২৫ সালে তিনি পরাবাস্তববাদের ঘোষণা 'ম্যানিফেস্ত দ্যু সুররিয়ালিজম' প্রকাশ করেন। পরাবাস্তববাদের সঙ্গে রোমান্টিকদের অনেকটা মিল আছে। স্বপ্ন, স্বপ্নাবিষ্টতা, কল্পনা প্রাধান্য, যুক্তি নিরপেক্ষতা ইত্যাদি রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য পরাবাস্তববাদে নতুন মাত্রা অর্জন করে। হার্বার্ড রীড ১৯৩৬ সালের জুন মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরাবাস্তববাদ প্রদর্শনীর চিত্রতালিকার ভূমিকায় লিখলেন–সাধারণ অর্থে পরাবাস্তব শিল্প রোমান্টিক নীতির অন্য নাম। তবে পরবর্তীকালে পরাবাস্তববাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠলেও একসময় এর আয়ুও শেষ হয় লেখক-শিল্পীদের নিষ্ক্রিয়তায়। তারপরও এ আন্দোলনের প্রভাব শিল্প-সাহিত্যে

ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মান্নান সৈয়দের আগেও বাংলা কবিতায় পরাবাস্তব শিল্প-অন্বেষার চর্চা হয়েছে। তিরিশের কবিরা বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ও বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-১৯৮২) কবিতায় এর প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা কবিতায় পরাবাস্তববাদকে প্রাধান্য দিয়ে এককভাবে কাব্যচর্চার প্রথম প্রয়াসের রূপকার হিসেবে মান্নান সৈয়দকেই বলতে হয়। *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* থেকে শুরু করে সমগ্র কাব্যভাবনাতেই মান্নান সৈয়দ এ শিল্পরীতির চর্চা করেছেন এবং হয়ে উঠতে চেয়েছেন স্বঘোষিত পরাবাস্তববাদী।

মান্নান সৈয়দের কবিতা মূলত উপমা, প্রতীক রূপক ও চিত্রকল্পপ্রধান। একটির পর একটি চিত্র তিনি সাজিয়ে যান তাঁর কল্পনার বিপ্রতীপ শিল্প-সৃজনে। প্রায়শই তাঁর কবিতায় রাত্রি অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের কবিতাগুলো যেন অস্ফুট জ্যোৎস্নায় অন্ধ ও রহস্যময়। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত মান্নানের কবিতায় ভাষারূপ পায় না। বরং কুয়াশা নক্ষত্র, শিশির, বাড়ি, দরোজা, গলি, সহিস এবং রাত্রিচারী পুলিশের আনাগোনায় তাঁর কাব্যজগৎ সীমাহীন রহস্যের মধ্যে নিপতিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত–

> ১.
>
> এই সন্ধে, মৌমাছির মতো ব্যস্ত শহর, যেন কোনো মহাকাব্য জ্যান্ত হয়ে উঠছে : জানালার পাহাড় হয়ে উঠছে আমার শরীর, শরীরের মধ্যে সন্ধের দোকান—কী ভীড়ের চাপ! পশ্চিম সীমা টেনে দিলে তুমি, সন্ধ্যে পড়ছে, তবু আমাদের বাড়ির বাইরে তেতো রাত, আমাদের বাড়ির বাইরে সেতুর ব্যান্ডেজ করা রাত, মেয়ে-মানুষ রাত, পশ্চিমে, ছাড়া পেয়ে ডাকাত নেমে পড়ল ঘোড়ার ক্লিপক্লাপ ভিজে মাঠে, লেনে-বাইলেনে[৭]
>
> ২.
>
> জ্যোৎস্না কী?— না, জ্যোৎস্না হয় জল্লাদের ডিমের মতো চুলহীন জলবায়ুহীন মুণ্ড, জোড়া-জোড়া চোখ, সাতটি আঙুরের একমুষ্টি হাত, রক্তকরবীর অন্ধকার, একগুচ্ছ ভুল শিয়ালের সদ্যোমৃত যুবতীকে ঘিরে জ্বলজ্বলে চিৎকার।।[৮]
>
> ৩.
>
> দু'পাশে তোমরা কাতার বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, চোখের মণিকে জিভ ফলিয়ে চাখো মজা, বাজাও আমিষাশী করতালি, আমার দিকে তাকিয়ে যে-আমি একটা মাছির মতো অসহায়, যে-আমাকে তিনটি স্তনের একজন মেয়েমানুষ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রঅবধি, যেখানে একটিমাত্র গাছে সমস্ত ফল ঝোলে আত্মহত্যা ভেবে।[৯]

উপর্যুক্ত প্রথম দৃষ্টান্তে সান্ধ্যকালীন ভূ-দৃশ্য অনেকটাই রহস্যময়, ধোঁয়া ও প্রহেলিকাপূর্ণ। পরাবাস্তবতার পেষণে কবির শরীর অসংখ্য মুখ জানলা-সদৃশ হয়ে উঠেছে

এবং তা যেন নাগরিক জৌলুস-সম্পন্ন দোকান। আর এর ভূ-চিত্রের বাইরে অন্য কল্পনার জগতে তখন তেতো রাত, ব্যান্ডেজ করা রাত এবং সর্বোপরি অশুভ মেয়েমানুষ রাতের মধ্যে ডাকাত পড়ার দৃশ্যাত্মক বর্ণনা কবির বিরুদ্ধ চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে জ্যোৎস্না হয়ে ওঠে কবির পরাবাস্তব আবহ সৃষ্টিকারী অনুষঙ্গ। জ্যোৎস্না সেও 'চুলহীন জলবায়ুহীন মুণ্ডু' সমেত 'জল্লাদের ডিম' বস্তু-লজিকহীন জ্যোৎস্নার এ বর্ণনার কারণ আবার ঘোষিত হয় কবিকৃত অন্য একটি বর্ণনায়— 'একগুচ্ছ ভুল শিয়ালের সদ্যোমৃত যুবতীকে ঘিরে জ্বলজ্বলে চিৎকার' অর্থাৎ কবির বিগত প্রাপ্তি জ্যোৎস্না-প্রয়াসী চৈতন্য শুধুই অন্তঃসারশূন্যতায় পর্যবসিত। মূলত এখানেই মান্নান সৈয়দ নৈর্ব্যক্তিক নন। তাঁর কাছে সমাজ, মানবিকতা এবং দায়বদ্ধতার সমস্ত প্রাপ্তিই যেন ভুল শেয়ালের সদ্যোমৃত যুবতীকে ঘিরে জ্বলজ্বলে চিৎকারে পর্যবসিত।

মান্নান সৈয়দ যে চিত্রকুহকময় পরাপৃথিবীর বাসিন্দা সেটির পটভূমি গ্রাম নয় বরং আমাদের চেনা নগরের মধ্যেই এক ভৌতিক অচেনা পরানগর। যে নগরে দোকানদার, ফেরেশতা, নক্ষত্র, পুলিশ, বেশ্যা, ঘোড়া, তিনটি স্তনের মেয়েমানুষ এবং 'সবুজ মশাল জ্বেলে নিসর্গ খেলছে তলোয়ার'[১০]। "পাগল এই রাত্রিরা একটি নরকের চৌকাঠ-বরান্দা-সিঁড়ি প্রস্তুত করে যেখানে শুরু হয় এক অবিশ্বাস্য পাতাল-ভ্রমণ। এ-ভ্রমণ আত্মার ভেতর প্রদেশে, অনালোকিত ফ্রয়েডিয় মনোগুহায়; অতপ্ত যৌনবাসনা, ধর্ষকাম, ক্রন্দন ও উল্লাস অবচেতন থেকে সারি সারি বেরিয়ে আসে এবং জ্যোৎস্নার নিচে ভয়ালসুন্দর নৃত্যে মগ্ন হয়। চেনা 'অলিতে গলিতে ঝিমন্ত ফোয়ারায়, বিচ্ছুরিত আঙুরঅলার গাড়ির পাশে, ইঁদুরের মতো ধাবমান ট্যাক্সিতে, রাস্তায় ও জোচ্চোরের প্রশংসিত আস্তানায় চলে সে মোচ্ছব'; এই নগরী বোদলেয়ারের নয়, মাতাল-ভিখিরি-গণিকার ত্র্যহস্পর্শে বিবমিষাময় ক্লান্তির নগরী এ নয়। এ দান্তের নরকযাত্রা।"[১১] সেই অর্থে ষাটের শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ প্রমুখের কবিতায় যে নাগরিক অবক্ষয়, বোহেমীয়পনা অস্তিত্বের তীব্র সঙ্কটে নেতি লক্ষণীয় মান্নান সৈয়দের কবিতা সে থেকে দূরবর্তী। আর মান্নান সৈয়দ নাগরিক হলেও তার আবহ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তযুগের স্মৃতিবাহী—

১.

> এই যে পুরনো একটা বাড়ি যেখানে অনেককাল মানুষ বাস করে না, আমরা কয়েক ঘণ্টার খাদ্য, এই বারান্দা এই চৌকাঠ এই মেঘ : সমস্ত এই বাড়িটাকে ইচ্ছে ছিল বদল করবো আমার শরীরের সঙ্গে, এখন এখানে গোধূলি আসন্ন বিশ্বাস তথা কৃষ্ণ গোলাপ। দ্যাখো—আস্তাবলে বাঁধা তিনটি স্তনের এক মাতাল রূপসী এমন এক ঘোড়ামানুষের জন্ম দিচ্ছে, যে সন্তান দুপুরবেলার অলৌকিক অন্ধকারে বসে শেলাই করবে গভীরতর দরোজা, মাতৃহননের।[১২]

২.

> ঝকঝকে ক্রীতদাস রুখে স্বচ্ছ বর্মে পোষা জানালায় গলা বাড়াল অপহৃত, আমার একটা দিন বারবণিতার বিনীত নাভিমূল হীন বরান্দায়, চোখে হাসে দুপুর, আপন-আপন মৌসুমের কুয়ো দুয়ো দ্যায় বিরতিবান ন্যাংটো গম্বুজে [১৩]

উপরের ১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে যে বাড়ির দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে সেটি সামন্ত যুগের । কবির শরীর বর্তমানের সঙ্গে অভিযোজিত হলেও এ বাড়ি অর্থাৎ চৈতন্য সামন্ত মানসিকতায় আকীর্ণ। আস্তাবল, ঘোড়া ইত্যাদির উল্লেখ আমাদের সামন্ত মানসিকতারই পরিচয় দেয়। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে ক্রীতদাস এবং বারবণিতা, দুপুরের চোখ-চেরা হাসি, গম্বুজ প্রভৃতি সামন্তবোধ রুচি ও শিল্পভাবনারই পরিচায়ক।

মান্নান সৈয়দের কবিতায় নাগরিক বীভৎসতাও আছে। পাশের লোকটির গলা নির্দ্বিধায় কেটে নিয়ে যায় এক লোক এবং চীনা প্লেটের উপর রাখে সেই মুণ্ডু—

> কী চড়া বাজার! আমাদের পাশের লোকটির সত্যি-সত্যি গলা কেটে নিল চীনে প্লেটের উপর এক গাঢ় দোকানদার। এরকম প্রমাণ আমি কখনো দেখিনি। তারপর করল কি?— না, তার কাটা-মুণ্ডু ঝুলিয়ে দিল দোকানের উইন্ডোর নিচে বিজ্ঞাপনে টপটপ।[১৪]

আর আছে সুবিধাবাদী, প্রতিবাদহীন নিরেট ভাল মানুষ, আত্মমুখী মানুষ। কারণ যখন এই মুণ্ডই প্রেয়সীকে ক্লেশনাশন উপহার দেয়া শেষ হয় তখন—

> এই বাতাস-সেই ভোরবেলা-যখন মিসেস রহমান ষাঁড়ের মতো কাঁধের নাবিকের উপর চড়ে বেরিয়ে আসে না আর, চীনে বাসনের উপর আপনাপন মুণ্ডু কেটে প্রেয়সীকে ক্লেশনাশন উপহার দেয়া শেষ হলো যখন—আমি বাসের মধ্যেকার মানুষের মতো বোকা, ঠাণ্ডা, নামহীন থাকলাম বসে।[১৫]

জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসায় মান্নান সৈয়দের একই শিল্পবোধ কার্যকর থেকেছে। তবে পারিপার্শ্বিক বর্ণনকৌশলে তাঁর সক্রিয় প্রতিক্রিয়াও লক্ষযোগ্য। *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*-র মান্নান সৈয়দ একেবারেই আত্মমগ্ন, অচেনা এক পরাপৃথিবীর নিবিষ্ট ভ্রামণিক। ষাটের কবিতার প্রধান অনুষঙ্গ যেমন বোহেমিয়পনা, যৌনতা, আত্মবিধ্বংসীমূলক জীবনদর্শন থেকে মান্নান সৈয়দ অতিদূর এক গুল্ম-আচ্ছাদিত রহস্যপূর্ণ জ্যোৎস্নার নিশাচারী। যেখানে পুলিশ, বেশ্যা, নক্ষত্র, ঘোড়া, মেয়েমানুষ আর শয়তান মিলে ভৌতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। *জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসাতে* তিনি একইভাবে শিল্প-অন্বেষায় নিমজ্জিত থেকেছেন। তবে খুব আবছাভাবে তিনি পারিপার্শ্বিকতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন বলেও প্রতিভাত হতে পারে। যদিও সেটি গভীরতর পর্যবেক্ষণেই কেবল দৃষ্ট হতে পারে।

"দুঃস্বপ্ন যদি জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের অভিজ্ঞান হয়, তবে এই পর্বের চিহ্ন হচ্ছে বিষাদ। এবং সেই সঙ্গে প্রেমের বিচ্ছেদচেতনা :"[১৬] আসলে প্রেমের আকুতি আর বিচ্ছেদাক্রান্ত মানসিকতায় যুক্ত হয়েছে সুগভীর যৌনচেতনা; সেটি আবার পরাবাস্তবের রঙচঙে আয়োজনে—

সূর্যাস্ত ফেলছে নিঃশব্দে ফেরেশতাদের রঙচঙে কাপড়-চোপড়;
উচ্চণ্ড দোকানবীথি ফুলে-ওঠা ভিড়ে কোলাহলে বালবে বাতাসে
এত খুশি, যেন চাঁদে যাবে;
জুতোর ফিতের প্রজাপতি উড়িয়ে লোকেরা যাচ্ছে লেকে-পার্কে-সিনেমায়
সূর্যাস্তের মতো রাঙা বেশ্যা
নীল জানালার পাশে বসে আয়না ধরেছে,
যেন মুখের সম্মুখে থাবা ধরে আছে নিবিড় বাঘিনী:[১৭]

বলাই বাহুল্য, নাগরিক এ প্রদোষকালীন বর্ণনাচিত্রে খেলে গেছে পরাবাস্তব চেতনার অনুষঙ্গসহ ইম্প্রেশনিস্ট বর্ণনাও। মূলত ষাটের কবিতায় সচেতনভাবে মান্নান সৈয়দই বিভিন্ন ইজমসমূহের চর্চা করতে চেয়েছেন। সূর্যাস্তের এ রঙচঙে বর্ণনায় এক ধরনের বর্ণাঢ্য আয়োজনও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তথাপি কবি যেন ভুল সময়ের আগন্তুক। যেন এ-শতাব্দী তাঁর আগম-সম্ভাবনাকে ধারণ করবার উপযুক্ত নয়। একারণেই পরাবাস্তবতার অন্তর্চাপ তাঁর প্রকাশপ্রক্রিয়াকে এভাবে চিহ্নিত করে—

কাঁচা আমের মাংস, নিসর্গ, আব্বার হাত, আলস্যের ডালপালা :
কিন্তু এইসব পাখি-চোখ গণনায়
কি করে চিহ্নিত করি এই শতাব্দীতে ভুল-করে-আসা আমি-টিকে?
বলা যায় ; পরেছে কাচের জুতো ঝড়।[১৮]

জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসায় মান্নান সৈয়দের পরাবাস্তব অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমচেতনা এবং তজ্জনিত বিচ্ছেদ ভাবনা এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাস্তবিক মান্নানের প্রেম ভাবনা শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আবুল হাসানের মতো নয় বরং অনেকটাই তিরিশি-চেতনায় তিনি প্রেমকে লালন করেছেন। জীবনানন্দ এমনিতেই মান্নানের সমগ্র কাব্যভাবনায় গভীর গভীরতর ছায়া ফেলে গেছে, এ ছাড়া সুধীন্দ্রনাথের প্রেমবোধও যেন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে শাশ্বতীর সুধীন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হওয়া যায় না —

১.
ঘাসের কবিতালোকে পড়ে আছে সবুজ স্যান্ডেল্
মনে আছে সবুজ গেলাশ?-কখন যে চলে গেছে
প্রেমিক-প্রেমিকা, তু ঐখানে কমলালেবুর
ষড়যন্ত্রে পড়ে কেঁদে মরে এক ব্যক্তিহৃদয়ের

মূর্খ স্বর্ণলতা : কোটি সূর্য চলে গেছে; হায়, তবু
কোন মুগ্ধবোধে ওরা সম্পাদনা স্বীকার করে না।।[১৯]

২.

সেই ক্ষণটিকে রাত সে দিয়েছি ছড়িয়ে
তবু ফিরে আসে মাধবীলতায় জড়িয়ে।
সেই ক্ষণটিকে আকাশে দিয়েছি মেলে,
ফিরে আসে তবু আলস্য ভরা বিকেলে।[২০]

১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবির চেতনা অনেকটাই জীবনানন্দ প্রভাবিত। প্রেমের ভাব-কল্পনায়, আবহনির্মাণে, শব্দপ্রয়োগে মান্নান এখানে একবারেই জীবনানন্দীয়। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তটি সুধীন্দ্রনাথের বিখ্যাত শাশ্বতী কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। সমালোচকের বক্তব্যেও তার উল্লেখ আছে–"একথা বলাই বাহুল্য যে, সুধীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিতাটির তীব্র ব্যক্তিগত আর্তি ও ক্রমপ্রসারমান বিশ্ববেদনা মান্নানের কবিতাটিতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একই ধরনের অনুভব থেকে কবিতা দুটির উদ্ভব, এবং মান্নানও যে শ্রাবণ-নিসর্গের প্রেক্ষাপটে তাঁর ক্ষণপ্রাপ্তির আনন্দকে লক্ষ বছরের প্রাপ্য সুবিধা হিসেবে দেখেছেন তা কেবল আপতিক নয়। কবিতাটির মর্মে সুধীন্দ্রনাথ, এবং অবয়বেও।"[২১] তারপরও মান্নান সৈয়দের কবিতা এ পর্বে ঘুরপাক খেয়েছে প্রেমেরই অলিন্দে। যদিও বিচ্ছেদ ভাবনায় তাঁর প্রেমচেতনা এ পর্বে শরীরী উত্তাপকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে। 'তুমি', 'বিচ্ছেদ; ১', 'বিচ্ছেদ : ২' 'হেমন্তী', 'নীলিমাক্রান্তি' প্রভৃতি কবিতায় এক ধরনের বিচ্ছেদ চেতনায় তিনি তাঁর প্রেম-সংলগ্ন হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় নারীর কামনার রূপটিও লক্ষ করবার মতো । নারী প্রায়ই তাঁর কবিতায় আসবাবসদৃশ মেয়েমানুষ, কামনাবাসনার এক উর্বর ক্ষেত্রবিশেষ, যেখানে নেই কোনো স্বাতন্ত্র্যবোধ; আবার এ নারীই যখন তাঁর কবিতায় অপ্রাপণীয়া, তখন তাতে সংযুক্ত হয় ব্যক্তিত্ববোধ। এটি এসেছে জীবনানন্দের সূত্রে। জীবনানন্দও বলেন—

ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে[২২]

আবার বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, সুজাতা, শেফালিকা বোস জীবনানন্দের নারীচেতনায় যুক্ত করেছে রহস্যময়, ব্যক্তিত্বপ্রবল অহমচেতনা। মান্নান সৈয়দের কবিতাও একই চেতনায় নারীর রূপায়ণ লক্ষ করা যায়—

১.
পাশ থেকে স্মৃতির ভিতরে চলে গেছো তুমি,
শুধু আমি এইসবে স্থির, তোমার কণ্ঠের ফেলে-যাওয়া গান আমাকে পাহারা

দিচ্ছে ঘিরে উড়ন্ত সিংহের মতো; উঁচু-নিচু রাতের বাতাসে ভায়োলিন বাজাচ্ছে কে সবুজ ত্বকের নারী বসে, ভালো করে চেয়ে দেখি : নারী নয়, নারীর অপর নাম কামিনীর ঝোপ।।[২৩]

২.

হাড়গোড়-শুদ্ধ আর রামধনু-দ্বারা ঘষা-মাজা

ডানা তুলে নাচো : দেখি; নাচো, নাচো, নাচো রে ময়ূর;

সম্পূর্ণ ময়ূর বাদ দিয়ে নাচ দেখে যেতে চাই।

কিন্তু শুধু অগ্নি জ্বলে নগ্ন মেয়েমানুষের মতো।।[২৪]

৩.

উড়েছে পাচনতুল্য অসম্ভব ভেদ করে

যেইখানে কোলে করে বসে আছে জ্যোতি

একজন-নামহীন, অশরীরী, দ্বন্দ্বময়, শান্তিলোভী- বলে :

আমি ভালোবাসি নাই কোনো মেয়েমানুষেরে

আমি অপমান ভালোবাসি[২৫]

ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪); *পরাবাস্তব কবিতা* (১৯৮২) প্রভৃতি কাব্যে মান্নান সৈয়দ তাঁর পরাবাস্তব অনুষঙ্গে আবর্তিত থেকেছেন। মূলত এ-পর্বে মান্নান সৈয়দ আপন শিল্পের জগতে ধ্যানস্থ হলেও বাইরের স্বদেশ-বাস্তবতায় বিচলিতও হয়েছেন অনেকটা পুষ্পবাণে ধ্যানচ্যুত মহাদেবের মতো। মুক্তিযুদ্ধ তাঁকেও স্পর্শ করেছে বেদনার বহুবর্ণিল এলিজি-সদৃশ। আর এক্ষেত্রে তাঁর অসহায় উচ্চারণ পরাবাস্তবের শব্দ-নির্মিতির মধ্যে চোখে পড়ে। এ-কারণে মান্নান সৈয়দের পরাবাস্তব কবিতা-চর্চা ভিন্ন মাত্রা প্রাপ্ত হয়। আর সৈয়দ একবারেই স্বপ্ন ও ফ্যান্টাসির ব্যাকরণে আবদ্ধ না থেকে এক নতুন কালের পরাবাস্তব বাংলা কবিতার জন্ম দেন। তিরিশোত্তর কবিদের মধ্যে যেটির সর্বৈব নিরীক্ষা ঘটে নি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত--

চকচকে কোনো বেয়োনেট্ না

পিস্তল না

বন্দুকের গনগনে গুলিও না

ঝাঁঝরা করেনি মেশিনগান

লুপ্ত করেনি গ্রেনেড

আমার চারপাশে ছিল কেবল এক অন্ধ কালো উন্মাতাল হিমকনকনে হাওয়া
সেই হাওয়ার ঝাপটায় হাত গিয়েছিল উড়ে
পা গিয়েছিল খসে
স্বপ্ন পালিয়ে গিয়েছিল
চোখ হয়ে উঠেছিল শ্বেত-পাথর[২৬]

এই 'হিমকনকনে হাওয়ার' দাপটে মান্নান সৈয়দ হাত-পা হারিয়েছেন, স্বপ্নচারিতার মধ্যে থেকে বাস্তবতার জাগরণের মধ্যে এসেছেন এবং কনকনে হাওয়ারূপী আসলে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি অকস্মাৎ পেয়েছেন নিজের শেকড়, অজস্র পুষ্পের বাগান, একটি স্বদেশ--জেগে উঠে দেখি/ আমার পা শিকড়ের মতো ঢুকে গিয়েছে পৃথিবীতে/ হাতের আঙুলগুচ্ছ ফুটে উঠেছে ফুলের মতো[২৭]। আর এক কথা বলাই যায় মান্নান সৈয়দের এই অসহায়ত্ব তার মনো-সংগঠনের জটিলতম প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত-- আসলে এক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দের মানস-গঠনের বৈশিষ্ট্যও ক্রিয়াশীল। যে সময়-সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁর পরিবর্ধন তার প্রভাব তাঁকে করেছে আত্মমুখী—

> আমি ছিলাম অসম্ভব নির্জন, একাকী, অসামাজিক, আত্মবৃত, বিবরবাসী। তাছাড়া ছিলাম রুগ্‌ণ। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। হয়তো সেজন্যই আমার উন্মুখিতা ছিল শিল্পে। নাচ, গান, ছবি আঁকা, লেখালেখি : এই চারটি ছিল আমার পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম।[২৮]

এই নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-মানসের অনিবার্য শিল্প-অনুধ্যানেই মান্নান সৈয়দ পরাবাস্তব শিল্পচর্চায় নিমগ্ন হন। তবে এই অসহ্য অসহায়ত্ব থেকে তাঁর পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষাও পরাবাস্তবের 'ডানাঅলা ঘোড়া'র গতিবেগের সঙ্গে প্রকাশ পায়। জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত' কবিতার মশারি যেমন ফিউচারিস্ট ব্যবহারে কবিকে অনির্বচনীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জৌলুসতার মধ্যে মৃত্যুহীন প্রাণের প্রাচুর্যকে স্পর্শ করেছে, তেমনি গতিবেগের ক্ষিপ্র 'ডানাঅলাঘোড়া'র আরোহী মান্নান সৈয়দও পরিত্রাণ চান 'স্বরচিত জেলখানা' থেকে বেরিয়ে আসতে। সুতরাং মান্নান সৈয়দের বিরুদ্ধে যে সমাজ-বিলগ্নতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় সেটি কবিমানসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যরূপে ধরে নিলে সমস্যা হয় না।[২৯] কারণ বিশুদ্ধ কলাকৈবল্যবাদীর পক্ষে সমাজ ও স্বকালের অভিঘাতজনিত উষ্মা কবিতায় নান্দনিক অসহায়ত্ব ও আকুতি হিসেবে প্রকাশ পাবে এটিই স্বাভাবিক। প্রচলিত সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষ্য হিসেবেই যে কবিকে কথা বলতে হবে এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। মান্নান সৈয়দের জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ থেকে এ-পর্বের পরাবাস্তব কবিতা এ-কারণেই নতুন মাত্রা পায়। কারণ, মান্নান সৈয়দ এই আত্মযন্ত্রণা থেকে অন্তত নিষ্কৃতিপ্রয়াসী–

ও ডানাঅলা ঘোড়া

আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও তোমার পিঠে এক নক্ষত্রের মতো

ছেঁড়া এই বর্তমান থেকে রাজকুমারীর মতো[৩০]

সুতরাং বহুদিনের আত্মবিবরবাসী কবির জীবন দেখার উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। আর তার স্বীকরণ–

অনেকদিন পরে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে

আদিম মানবের মতো

দেখব সব ফের নতুন চোখে

স্বরচিত জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে

দেখব সব সবুজ[৩১]

মাছসিরিজ কাব্যে মান্নান সৈয়দ পরাবাস্তবতার অনুষঙ্গে বহুলভাবে প্রতীকাশ্রয়ী। এই মাছ মান্নান সৈয়দের কবিতার বহুবর্ণিল শিল্প-আত্মার প্রকাশ। মাছ তাঁর কবিতায় অনবদ্য লিবিডো তাড়না, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রেষণ, সৌন্দর্য-নির্মাণের স্পৃহা ও বোহেমিয়পনার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে এই পর্বে 'মাছ' মান্নান সৈয়দের পরাবাস্তব চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রতীকের নির্দিষ্ট সেতু-বন্ধ–

পাঁচটি উজ্জ্বল মাছ ঝর্না থেকে নেমে এসেছিল।

এখন, রহস্যময় জলে খেলা করে অবিরল।

পদ্মায় গিয়েছে একটি-মেঘনায় যমুনায়-সুরমায়-

আর একটি গোপন ইচ্ছায়।[৩২]

২.

অনেক রুপোর মাছ বেরিয়েছে নৈশভ্রমণে।

শরতের মাঝরাতে উঠেছে আশ্চর্য হাওয়া।

আজো কি খুলেছে কোন উড়ো নদী?–

যখন ব্যালকনি ডাকে,'এসো লাফ দাও।[৩৩]

১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে মাছ হয়ে উঠেছে কবির পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্যোতক। তার মূলস্রোত যাচ্ছে লিবিডোর সমুদ্র-সঙ্গমে। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে বোহেমীয় কবির চেতনার প্রতীক এই মাছ একাকিত্বে নিমজ্জিত। আর তারই চেতনার মধ্যে আত্মবিধ্বংসী প্রবণতার শিকার।

খ.

পরাবাস্তব কবিতা চর্চায় আবদুল মান্নান সৈয়দ যে শিল্পজগতের রূপকার তার কারুকার্যখচিত শিল্প-প্রকরণও এক অদ্ভুত বর্ণবহুল রহস্যময়তায় নিবিষ্ট। মান্নান সৈয়দ রঙের বিচিত্র প্রকাশে, শব্দকুহকী চিত্র ও চিত্রকল্পে রূপনির্মিতিতে এবং আলোর বিচ্ছুরণ ও প্রতিসাম্য রচনায় তাঁর কবিতাগুলোকে নির্মাণ করেছেন। আর বাংলা কবিতায় মান্নান সৈয়দকে এ-জন্য এনে দিয়েছে শিল্পসিদ্ধি। তাঁর উপমা-প্রতীক ও চিত্রকল্পের জগৎ কুয়াশা নক্ষত্র, শিশির, বাড়ি, দরোজা, গলি, সহিস, পুলিশ, ইঁদুর, ট্যাক্সি, মেয়েমানুষ, মশাল, ঘোড়া, চাঁদ, জ্যোৎস্না, বরফ, কুকুর, মৌমাছি, মাছ প্রভৃতির মাধ্যমে এক ঘনীভূত রহস্যময় নাগরিক আয়োজনে সমাকীর্ণ।

ষাটের কবিতায় ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে কবিদের অভিজ্ঞতা ও প্রকাশভঙ্গি বিচিত্র ও নিরীক্ষাধর্মী। ইম্প্রেশনিজম (Impressionism) বা 'অন্তর্মুদ্রাবাদ' কথাটি চিত্রকলাকে ঘিরেই বেশি আলোচিত। বহির্বাস্তবতার রঙ, রূপ, রস, প্রভৃতির পারিপার্শ্বিকতাসহ বর্ণ ও আলোর প্রতিসাম্যে উপস্থাপিত করাই মূলত ইম্প্রেশনিস্টদের উদ্দিষ্ট। একজন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী বা কবি আলোর বহুবর্ণিল রঙ, কালিক প্রবাহে, অর্থাৎ ভোরে, সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে, তার উপলব্ধি ও অভিব্যঞ্জনাকে তুলে ধরেন। কোন্ পরিবেশে আলোর অবয়ব কেমন এবং তার রূপান্তর চিত্রকর্মে বিধৃত করাই ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর মূল লক্ষ্য। বর্ণ ও আলোর মেজাজ পরিস্ফুট করার মধ্যেই অন্তর্মুদ্রাবাদের গুরুত্ব নিহিত। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতাতেও এরকম চিত্রকল্প দৃষ্টিগ্রাহ্য:

> সূর্যাস্তের মতো রাঙা বেশ্যা
> নীল জানালার পাঁাতনে বসে আয়না ধরেছে
> যেন মুখের সম্মুখে তার ধরে আছে নিবিড় বাঘিনী;
> সারি-সারি আমগাছ মেহগনি-বৃক্ষ হয়ে যায়,
> তার ফাঁকে-ফাঁকে
> জাফরান রোদ সন্ধ্যার চিকুরে আঁচড়ায় সোনার চিরুনি।[৩৪]

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকল্পের প্রয়োগও লক্ষযোগ্য। অনেকটা নিরীক্ষাক্রান্ত হয়ে, অবক্ষয় ও ব্যক্তিসমাজজীবন থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়েও কবির এরকম শিল্পকলার প্রয়োগ। দৃষ্টান্ত—

> কী চড়া বাজার! আমাদের পাশের লোকটির সত্যি-সত্যি গলা কেটে নিল চীনে প্লেটের উপর এক গাঢ় দোকানদার।... .... তারপর করল কি?—না, তার কাটা-মুণ্ডু ঝুলিয়ে দিল দোকানের উইন্ডোর নিচে বিজ্ঞাপনে টপটপ।[৩৫]

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে একটি খুনের ঘটনা পরিবেশটিকে ঘনীভূত করে তুলেছে। পাশের লোকটিরই গলা কেটে চীনা প্লেটের ওপর মুণ্ডের স্থাপন করা অতঃপর এটিকে আরো দৃশ্যগ্রাহ্য, সন্ত্রস্ত করে তুলতেই দোকানের উইন্ডোর নিচে মুণ্ডু ঝুলিয়ে দেয়া যেমন এক্সপ্রেশনিস্টিক, তেমনি তাজা রক্তের ঝরে পড়ার দৃশ্যটিকে ইন্দ্রিয়ঘন করে 'টপটপ' শব্দটি।

জ্যোৎস্না', 'চাঁদ', 'অন্ধকারের', 'কুকুর' প্রতীকীচিত্রও মান্নানের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে কবির বিচিত্র মানসিকতার অনুষঙ্গ হিসেবে। 'জ্যোৎস্না' হয়ে উঠেছে অন্ধকার সময়ের কবি-চৈতন্যের উদ্ভাসন হিসেবে। সমাজপঙ্কিলে অভিযোজন-অক্ষম কবিমানসের অসহায়ত্বও জ্যোৎস্নার প্রোজ্জ্বল আলোকপ্রক্ষেপে ধরা পড়েছে। কখনোবা ম্লান, ধূসর, অস্পষ্ট পরাচৈতন্যের মধ্যে রাতের নিপতিত জ্যোৎস্না তৈরি করে রহস্যময়তা, অস্পষ্টতা ও দিকনির্দেশহীন চেতনাও।

১.

সবুজ চাঁদের নিচে পড়ে আছে আমার শরীর।
চেতনা তারার নিচে।[৩৬]

২.

হাতে বানানো রুটির মতো চ্যাপ্টা, রোগা পাৎলা চাঁদ[৩৭]

৩.

কুকুরের চোখে চাঁদ ঢেকেছে মেঘের মথ
পণ্ডিতের মত লাফিয়ে লাফিয়ে এসে[৩৮]

৪.

জ্যোৎস্না ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে দরোজায়, সব দরোজায়।[৩৯]

৫.

জ্যোৎস্না কী? না, জ্যোৎস্না হয় জল্লাদের ডিমের মতো চুলহীন, জলবায়ুহীন মুণ্ডু[৪০]

৬.

আর আমি নগ্ন ও অসহায়—একটা কুকুরের মতো, শাদা রাস্তার মতো, বেয়াড়া বৃক্ষের মতো[৪১]

উপমা, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত অলঙ্কারসমূহ মান্নান সৈয়দের কবিতায় সৃষ্টি করেছে একধরনের আপাত-উদ্ভট চিত্রবৈষম্য। তাঁর উপমার জগৎ প্রায়শই পরাবাস্তব আবহের সঙ্গে প্রতীকী চিত্রকল্পের রহস্যঘনতা সৃষ্টি করে। কখনো কখনো উপমাগুলো বস্তুসাদৃশ্যের

ভিত্তিতে নির্মিত হলেও আছে সময়ের তির্যক অভিঘাতের চিহ্ন। কবির উপমা, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত অলঙ্কারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

উপমা:

১.

ইঁদুরের মতো ধাবমান ট্যাক্সিতে, রাস্তায় ও জোচ্চোরের প্রশংসিত আস্তানায় সারারাত্রি
সর্বত্র ফেরি করে বেড়িয়েছে শরীর[৪২]

২.

দেখেছি হরিৎভেদী প্রশান্ত ল্যাম্পপোস্টে দাঁড়িয়েছে পাতার ভিতরে
সুপক্ব ফলের মতো বাল্ব জ্বেলে[৪৩]

সমাসোক্তি:

আমাকে ঘিরে-ঘিরে নাচছেন সাত-আঁজন তিনকোনা চারকোনা পাঁচকোনা আয়না[৪৪]

অন্যাসক্ত:

১.

ছিটকে যাবো এই সরলরেখা থেকে মাতাল ট্রেনের মতো[৪৫]

২.

আমাদের বাড়ির বাইরে তেতো রাত[৪৬]

মান্নান সৈয়দের কবিতায় আছে রঙের বহুবর্ণিল বিচ্ছুরণ। যেন রঙের ভুবনে কবি আত্মার মধ্যে তুলির পরশ লাগিয়ে আত্মমগ্ন। কবিতায় রঙ ব্যবহারে মান্নান সৈয়দ বর্ণবৈভবময়, প্রোজ্জ্বল, আবার কখনো বর্ণচোরা। প্রচলিত রঙকে ভেঙে-চুরে বিচিত্র রঙের প্রতিসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। কখনো ফ্যাকাশে ধূসর আলোছায়াময়, একধরনের বিবর্ণতাও শব্দচিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। রাত্রিচারী বলে তাঁর রঙগুলোও আলোছায়ার কারসাজিতে নিপুণ। আবার কখনো কখনো তাঁর কবিতায় রঙ ব্যবহারের বৈপরীত্যও সৃষ্টি করেছে এক ধরনের উদ্ভট, দুঃস্বপ্নময় মায়ার জগৎ। এই রঙকে যেমন ইম্প্রেশনিস্টদের কোমলতায় ফেলা যায় না তেমনি এক্সপ্রেশনিস্ট কিংবা ফবিস্টদের বর্ণাঢ্যতা দিয়েও নির্দিষ্ট করা চলে না। প্রায়শই বস্তুর রঙ বস্তুতে বিলীন, প্রিজম-সদৃশ বহুবর্ণিল বিস্তারে খণ্ড-বিখণ্ড। যেমন:

এই রাত্রিরা সেই লাল আলোর ভালো যা তোমাকে প্রশস্ত
স্ট্রিট থেকে নিয়ে যাবে কঙ্কালের সরু সরু পথে, অনাব্য স্ত্রীর মতো
কেবলি অন্যদিকে[৪৭]

উপরের উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাল রঙ' যার প্রেক্ষাপট বর্ণচোরা ও রহস্যময়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণের মধ্যে যে বর্ণাঢ্য ও অতিরেক সম্প্রকাশিত তা এখানে অনুপস্থিত। কারণ এই 'লাল আলোর ভালো' যা প্রশস্ত স্ট্রিট থেকে একটি অশুভ কঙ্কালের পথে অর্থাৎ ভুল পথে পরিচালিত করে সেটি ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ এই লাল রঙের সঙ্গে বিশেষণ 'ভালো'র সংযোগই একে করেছে রহস্যময়, বর্ণচোরা (যদিও তা লাল) ও অস্পষ্ট, আবার যেখানে রঙের উজ্জ্বল বর্ণবৈভব ফবিস্টদের মতই ব্যবহৃত হয়, এবং তা সুদৃঢ় কাঠিন্যকে প্রকাশ করে মান্নান সৈয়দের কবিতায় তা ইম্প্রেশনিস্ট আবহকে অস্বীকার করে না। যেমন,

তারি সন্ধ্যালোকে
টালির উপর থেকে রঙচঙে একটি মোরগ লাফিয়ে নামলে
মনে হয়
কোনো শিল্পী বর্ণস্নাত করেছে মোরগটিকে
অতি যত্নে লাল পরিশ্রমে[৪৮]

এখানে রঙচঙে মোরগের বর্ণাঢ্য, বর্ণস্নাত উজ্জ্বল রূপান্তর পেয়েছে কাঠিন্য সুদৃঢ় রেখাচিত্র। মূলত এ ধরনের বর্নোজ্জ্বল প্রকাশ ফবিস্টদের অন্বিষ্ট মাধ্যম। মোরগের লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যও বলীয়ান জীবনের কঠিন প্রকাশ। কিন্তু সন্ধ্যার প্রচ্ছায়া ও কোমল আলোক বর্ণবিভা এই প্রবল রঙের অভিঘাতে এনেছে অস্পষ্টতা। মোরগের কঠিন উজ্জ্বল রঙ সান্ধ্যকালীন ভূ-দৃশ্যের ধূসরতায় অনেকটা ম্লান। শিল্পীর 'লাল পরিশ্রমও' একটি ইতিবাচক কোমলতার ইঙ্গিত বহন করে।

প্রিজমসদৃশ বহুবর্ণিল বিচ্ছুরণে প্রতিসাম্য সৃষ্টি করে নতুন ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায় মান্নান সৈয়দের কবিতায়। ফলত অসংখ্য রঙের মধ্যে একটি রঙের কেন্দ্রীভূত রঙ কবিতার ভাববিন্যাসে আনে দ্যুতিময় রহস্যময়তা। যেমন লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতির সংমিশ্রণে রশ্মিময় বর্ণবৈভব—

কালো দড়ির ভিতরকার ফেটে পড়া হাসির মতো সরোবর থেকে লাল-নীল-সবুজ মাছ
তাকে জেনো আমার যৌবন-কাঁচের ভিতরে
জলে আঁশ ঝেড়ে ফেলে জ্বলতে-জ্বলতে চলে যায় তৎপর মাছের ঝাঁক[৪৯]

আবদুল মান্নান সৈয়দের কাব্যভাষাও পরাবাস্তব চেতনাবাহী, স্বপ্নকুহকময় ভগ্নক্রম ব্যাকরণে গাদ্যিক ঢঙে বিন্যস্ত। সেই সঙ্গে প্রযুক্ত কবির রোমান্টিক চেতনা, অস্তি ত্বসংরাগ, নিরেট বিশুদ্ধ শিল্পান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি। আর পরাচৈতন্যের ভাষাও প্রতীক, রূপক-প্রতিরূপকময় কুহকীচিত্রে বিন্যস্ত। মশাল, বরফ, কবর, মেয়েমানুষ, জোচ্চোর, নৃশংসতা, ভৌতিক আবহ, প্রবঞ্চনাময় কুহকী প্রশস্ত সিঁড়ি, আস্তাবল, ঘোড়া প্রভৃতির

আড়ম্বরে চলেছে চিত্রাত্মক বর্ণনা। সুতরাং দৃশ্যপরম্পরায় কবির বর্ণনাংশ সৃষ্টি করে যায় রহস্যের দ্যোতনা।

ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর এই পরাবাস্তব শিল্প-সৃজনের জন্যই পেতে পারেন ভিন্ন মাত্রিকতা। আসলেই পরাবাস্তব কবিতার জীবনব্যাপী এই সর্বৈব কাব্যসাধনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে বিরল। তবে এই একরৈখিক, পুনরাবৃত্ত শিল্প-অনুধ্যান মান্নান সৈয়দের কবিতাকেও করেছে একটি বৃত্তের মধ্যে রেখাবন্দী। আত্ম-অতিক্রমের কঠিন শিল্পসিদ্ধি মান্নান সৈয়দ অর্জন করতে চান নি। এ-কারণে বাংলা কবিতার পথ-পরিক্রমায় মান্নান সৈয়দের কবিতা ফেলে আসা জংশনের একটি গতিচ্যুত রেল-সড়কের নিছক হাতছানিও হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. সুধীর কুমার নন্দী, নন্দনতত্ত্ব, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ৪২৭
২ অশোককানন, কবিতাসমগ্র, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩
৩ পাগল এই রাত্রিরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪ প্রাগুক্ত
৫ প্রাগুক্ত
৬. Abrams. M.H., A Glossary of literary Terms. 1993. P.205
৭ সমস্ত ভাসান দিলাম সমস্ত উড়াল, কবিতাসমগ্র, ঢাকা. ২০০২, পৃ ৮
৮ জ্যোৎস্না, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৯ গাধা এবং আমি, প্রাগুক্ত, ২০০২, পৃ. ৩
১০ দুপুরবেলার প্রকল্পনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
১১ খোন্দকার আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশের কবিতা অন্তরঙ্গ অবলোকন, ১৯৯৪, পৃ.৬১
১২ পাগল এই রাত্রিরা, কবিতাসমগ্র, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪
১৩ একেকটি দিন এককটি সবুজভুক সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১৪ সমস্ত ভাসান দিলাম সমস্ত উড়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১৫ প্রাগুক্ত
১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১৭ লণ্ঠন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৮ প্রাগুক্ত
১৯ ব্যক্তিগত তাঁত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২০ তুমি : ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২১ খোন্দকার আশরাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২২ জীবনানন্দ দাশ, বোধ, কবিতাসমগ্র, আবুল মান্নান সৈয়দ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৯

২৩ উড়ন্ত অনুভূতি, কবিতাসমগ্র, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৫
২৪ ইন্‌সম্‌নিয়া : তার দরোজা-জানালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২৫ পরবাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
২৬ অনুপস্থিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২৭ প্রাগুক্ত
২৮. আবদুল মান্নান সৈয়দ, স্মৃতির নোটবুক, ঢাকা ২০০০, পৃ. ২০
২৯ ...একটি প্রবণতা লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে ষাটের কবিদের রচনায় সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ কবিতার ধারা। অলোক সরকার যে অর্থে বিশুদ্ধতার অনুসারী ছিলেন সেই অর্থে অবশ্য নয়; সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাই হচ্ছে এই বিশুদ্ধতার প্রধান লক্ষণ। মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১০
৩০ ও চৈত্র ও ডানাঅলা ঘোড়া, কবিতাসমগ্র, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৮১
৩১ প্রাগুক্ত
৩২ পাঁচটি উজ্জ্বল মাছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
৩৩ কল্পনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
৩৪. লণ্ঠন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩৫. সমস্ত ভাসান দিলাম সমস্ত উড়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৩৬. মরণের অভিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৭. চাঁদে পাওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩৮. সুবাতাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩৯. অশোককানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪০. জ্যোৎস্না, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮
৪১. গাধা এবং আমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪২. পাগল এই রাত্রিরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪৩ সুবাতাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪৪. পাগল এই রাত্রিরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪৫. গাধা এবং আমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪৬. সমস্ত ভাসান দিলাম সমস্ত উড়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৪৭. পাগল এই রাত্রিরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪৮. লণ্ঠন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৪৯. জীবন আমার বোন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০